বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তি

ধারাবাহিক
বিশেষ কলাম ৩

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

যে ভবন থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহিদানের ওপর গুলি করার হুকুম দেয়া হয়, সেই বর্ধমান হাউস হলো বাংলা একাডেমি। স্থাপিত হলো শিশু একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মহিলা পুনর্বাসন সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, দশটি সেবার করপোরেশনসহ সব ধরনের প্রতিষ্ঠান

৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমাদের যার যা কিছু আছে তা নিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।' এটাকে হুকুম হিসেবে মেনে নেয় সবাই এবং ২৫ মার্চের পরে বিশেষ করে মফস্বল এলাকায় জনসাধারণ হাজার হাজার বাঁশ, বৈঠা, লগি নিয়ে ব্যারিকেড দিয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন করে ছাড়ার তাদের দৃঢ় পণ ছিল। তখন একটা ছোট ভুল হয়েছিল। এ ভুলের মাশুল সৌভাগ্যবশত আমাদের দিতে হয়নি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে একবার ঘোষণা করা হলো 'বঙ্গবন্ধু আমাদের সঙ্গেই আছেন। যুদ্ধ করছেন।' এটা কিন্তু খুবই ভুল একটা ঘোষণা ছিল। তাড়াতাড়ি অবশ্য এ সর্বনাশা ঘোষণা বাদ দেওয়া হয়। পরে আর বলা হয়নি। এই সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলতে পারত। তারা বোধহয় শোনেনি কিংবা তাদের অত বুদ্ধি ছিল না কোনোকালেই।

স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে হয়তো অহেতুক একটা বিতর্ক আছে। মেজর জিয়াউর রহমান একটি ঘোষণা দিয়েছিলেন ২৭ মার্চ। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে আওয়ামী লীগ নেতা হান্নান ২৬ মার্চ কালুরঘাট থেকে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার ২৪ ঘণ্টা পর তদানীন্তন মেজর জিয়া ঘোষণা দিয়েছিলেন : 'ইন দ্য নেইম অব আওয়ার গ্রেট লিডার শেখ মুজিব।' বঙ্গবন্ধুর নামে পঠিত এই ঘোষণাটারও মূল্য আছে বৈকি! যাহোক এসব বিতর্কের অবসান হওয়া দরকার। আমরা মনে করি, বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আদর্শবিচ্যুত কিছু মানুষ বাদে প্রায় সব মানুষ স্বাধীনতার পক্ষে এবং স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে সোনার বাংলা করার আদর্শে কেউ কেউ হয়তো বিশ্বাসী নন। বিভিন্ন পথ থাকতেই পারে। স্বাধীনতা তো সহজে আসেনি। অতি মহার্ঘ দিয়ে কেনা বাংলার স্বাধীনতা। অনেকেই এর মূল্য বোঝেন না। অনেক দেশে স্বাধীনতাযুদ্ধ অনেক লম্বা হয়েছে। আলজেরিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে মূল্য আরও বেশি দিতে হয়েছে এবং তাতে স্বাধীনতার প্রতি দরদটা আরও বেশি হয়েছে। আরেকটি বিষয়, যেসব দেশ দীর্ঘকালীন স্বাধীনতাযুদ্ধের পর স্বাধীন হয়েছে সেখানে স্বাধীনতার পর যে বিশৃঙ্খলা হয়েছে, খাদ্যাভাবের ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জাতির জনক সে রকম হতে দেননি। ১৯৭৪ সালের অক্টোবরে খাদ্যাভাবে কিছু মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করে থাকতে পারে। কিন্তু বাসন্তীর গল্প যে বানানো গল্প সেটা এখন পরিষ্কার হয়ে এসেছে।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত যে সময়টা সেটা আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার। সারা বিশ্বে চরম অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ছিল। খাদ্যশস্যের অভাব, ফসলহানি ছিল ব্যাপক। পেট্রোলিয়ামের মূল্য ব্যারেলপ্রতি ৪ ডলার থেকে ১৪ ডলারে হয়। কাজেই বাংলাদেশের বাজেটের একটা বিপুলাংশ পেট্রোলিয়াম আমদানিতে বেসামাল হয়ে গেল। এ ছাড়া বাংলাদেশে ভয়ঙ্করভাবে একটা খরা দেখা গেল। ফসলহানি হলো, খাদ্য সংকট দেখা গেল।

এ প্রেক্ষিতে জাতির পিতা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) করলেন। খাদ্যসহ সব নিত্যব্যবহার্য পণ্য আমদানির ব্যবস্থা করলেন। কনজিউমার সাপ্লাই করপোরেশনের মাধ্যমে আমদানি করা খাদ্যপণ্য ও অন্য নিত্যব্যবহার্য সারা দেশে বিতরণের ব্যবস্থা নিলেন। স্ট্যাটিউটেরি রেশনিং এবং মডিফাইড রেশনিং করলেন। কাউকে না খেয়ে মরতে দেওয়া হলো না। এ কৃতিত্ব বঙ্গবন্ধুকে দিতে চান না কেউ কেউ।

শিল্প-কলকারখানা, ব্যাংক, বীমা, কোম্পানির সব মালিক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি। তারা পালিয়ে গেল। সেগুলো অধিগ্রহণ করতে হলো। সুইডেন এবং কানাডা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা দিল। তা দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ খোলা হলো, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হলো। বাণিজ্যিক ব্যাংক, বীমা সব স্থাপন করা হলো। কল-কারখানা আবার চালু করা হলো। স্কুল, কলেজ পুনর্বাসন করা হলো। রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট মেরামত করা হলো। রাশিয়া সব ধরনের সাহায্য দিল। মাইন পরিষ্কার করা হলো। পূর্ব জার্মানি আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিহ্নিত করে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে তাদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। ইরাক খাদ্যশস্য দিয়ে বড় ধরনের সাহায্য করল। ডাচরা উড়োজাহাজ দিল। ডেনমার্ক সাহায্য দিল অকাতরে। সব মিলিয়ে আমাদের দেশের অবস্থা ধীরে ধীরে স্থিতিশীল করা হলো। লোক যাতে কেউ না খেয়ে মরেন সে ব্যবস্থা করা হলো।

বলার অপেক্ষা রাখে না, বঙ্গবন্ধুর সারাজীবনের রাজনৈতিক সাধনা ছিল জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি। তার কার্যক্রম ও চিন্তাভাবনার মধ্যে বিষয়টি গভীর ও বিপুলভাবে সন্নিবেশিত ছিল। তার ধ্যান-ধারণার মধ্যে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি, নিম্নবিত্ত মানুষ, কৃষাণ-কৃষাণী এবং শ্রমজীবী। তার কল্পনায়, তার চিন্তায়, তার রাজনীতিতে, তার দর্শনে সদা দীপ্তমান ছিল অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা ও ঐশ্বর্যের চিন্তাভাবনা। দেশ স্বাধীন করার আগে যে আন্দোলনগুলো সংঘটিত হয়েছিল, তার প্রতিটি অর্থনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়েছিল। যেমন ছয় দফা আন্দোলন। সেখানেও অর্থনৈতিক বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। কীভাবে দুই অর্থনীতি চলবে এক দেশে। কীভাবে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য হবে? কীভাবে আলাদাভাবে মুদ্রাব্যবস্থা পরিচালনা করা যাবে? স্বাধীনতা লাভের পর জাতির জনক যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, সেখানেও অর্থনৈতিক বিবেচনা ছিল মুখ্য। অর্থনৈতিক সংস্কারের অধীন তিন ধরনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। একটি স্বল্পকালীন পরিকল্পনা, একটা মধ্যবর্তী, অন্যটি সুদূরপ্রসারী। দেশ একটি রক্তক্ষয়ী ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন হলো। পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাইল না বলে যৌথ বাহিনীর কাছেই বশ্যতা স্বীকার করল। এর ২৫ দিন পর আন্তর্জাতিক চাপে মুক্তি পেয়ে জাতির জনক বিজয়ীর বেশে দেশে ফিরলেন ১০ জানুয়ারি ১৯৭২। ভাবতে থাকলেন কীভাবে অর্থনীতির চাকাকে সচল করা যায়। কিছু বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। বন্দর ধ্বংস করা হয়েছিল, মাইন পোঁতা ছিল সব অঞ্চলে। রেল, ব্রিজ, কালভার্ট ধ্বংস করে গেছে পাকিস্তানি পলায়নপর বাহিনী। রাষ্ট্রের কোষাগারে বিদেশি মুদ্রা একেবারেই ছিল না। কোনো খাদ্যশস্য ছিল না, কোনো কেন্দ্রীয় ব্যাংক নেই। ছিল হা-হুতাশ আর স্বাধীন দেশে আলাদিনের প্রদীপে সব কিছু পেয়ে যাওয়ার উচ্চাশা। ভারতসহ মিত্রদেশগুলো থেকে খাদ্য, পণ্য এবং বিভিন্ন সাহায্য এনে পরিস্থিতি সামাল দিতে চেষ্টা করলেন। বন্দরগুলো মাইনমুক্ত করে কার্যকর করার চেষ্টা করলেন জাতির জনক। সব অবকাঠামোকে পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা নিলেন। পাশাপাশি জনজীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে তিনি কোনো সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি। সংবিধান প্রণয়ন, শিক্ষানীতি প্রণয়ন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি শুরু হলো। যে ভবন থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহিদানের ওপর গুলি করার হুকুম দেয়া হয়, সেই বর্ধমান হাউস হলো বাংলা একাডেমি। স্থাপিত হলো শিশু একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মহিলা পুনর্বাসন সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, দশটি সেবার করপোরেশনসহ সব ধরনের প্রতিষ্ঠান। *(চলবে)*

লেখক : বঙ্গবন্ধুর একান্ত সচিব ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর